অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অমিয় দেব

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা আমি প্রথম শুনেছিলাম বুদ্ধদেব বসুর এক চিঠিতে। তারিখ ২৭ জুলাই, ১৯৬৬। আমি তখন আমেরিকার ইন্ডিয়ানাতে আমার আরব্ধ পড়াশুনার শেষ বিলম্বিত পর্বে। 'যাদবপুর তু.সা.বি.র এক বোহেমিয়ান ছাত্র 'কবিতা-পরিচয়' নাম দিয়ে একটা পত্রিকা বের করছে, দুটো বিখ্যাত পত্রিকার নামের এই সমন্বয়ের অর্থ হল Explication। নরেশ, প্রণবেন্দু, অলোকরঞ্জন, সুনীল, শঙ্খ ইত্যাদি অনেকেই নিয়মিত লিখছে— সম্পাদকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমিও একটা এক্সপ্লিকাসিয়ঁ লিখলাম, সুধীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ('দশমী'র দ্বিতীয় কবিতা) বিষয়ে।' খুব চমকপ্রদ খবর। এই 'বোহেমিয়ান' ('বোহেমিয়ান'-এর সদর্থক ব্যবহার আর কী হতে পারে?) সম্পাদকের নাম শোনা গেল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির দৌলতে এক্সপ্লিকাসিয়ঁ দ্য তেক্সৎ আমার অজানা ছিল না, ইংরেজি 'এক্সপ্লিকেটর' পত্রিকাও কিঞ্চিৎ ঘেঁটেছি; কিন্তু বাংলায় কবিতার পাঠ উন্মোচন বোধহয় এই প্রথম। ভাবার্থ ছিল, ভাবসম্প্রসারণ ছিল, সম্ভাব্য ইতিহাস বা দর্শনাশ্রয়ী কবিমানসের অনুসন্ধান ছিল; কিন্তু কবিতার অবয়ব বিশ্লিষ্ট করে তার সত্তা নিরূপণের চেষ্টা খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' বিষয়ে যা লিখেছিলেন তাকে কি আমরা এক্সপ্লিকাসিয়ঁ বলব? তা জানেন নরেশ গুহ, সুতপা ভট্টাচার্য ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁরা এর 'কবিতা-পরিচয়' লিখেছিলেন।

কবিতাপাগল এই যুবক, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, পুস্তকে-পত্রিকায় কবিতাপাঠের নামে যেসব বক্তৃতা চলে (যাদবপুর তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগেও, যেখানে তিনি পড়তে এসেছিলেন ১৯৬৫-তে এবং ভর্তির ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি বিভাগ থেকে কী পাবেন) তাতে ক্লান্ত হয়ে চাইছিলেন কবিতা মুখ্যত কবিতা হিসেবে পড়া হোক। তার রসাস্বাদন ব্যহত করে আনুষঙ্গিকটাই যেন বড় না হয়ে ওঠে। কবিজীবনের খুঁটিনাটি নয়, তাঁর ঘোষিত বা অঘোষিত মতাদর্শ নয়, নয় তাঁর তথাকথিত জীবনদর্শন— কবিতায় গ্রন্থিত শব্দসমূহের দ্যোতনাই হোক কবিতাপাঠকের উপাত্ত। কবিতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নয়, কবিতার ভিতরে থেকেই পড়া হোক কবিতা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সামনে কোনও 'মডেল' ছিল কিনা জানি না, তবে কবিতার 'পরিচয়'ই যে তাঁর গন্তব্য ছিল তাতে

কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য সেই পরিচয়ের মাত্রা কম-বেশি হতেই পারে, ভয়ও থাকতে পারে তাতে ঈষৎ যান্ত্রিকতার। তাছাড়া কবিতা কেবল হবেই, কিছু বলবে না, এ নিয়েও তর্ক চলতে পারে। তবু 'কবিতা-পরিচয়' প্রক্রিয়াটি ভেবে উঠতে পারার জন্য বাংলা কবিতা পাঠ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে ঋণী থাকবে।

আসলে নতুন কিছু ভেবে উঠতে পারার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। অপূর্ব বলেই নতুন নয়, সত্যিকার নবীনতা যাতে আছে তেমন নতুন। তার জন্য যতটা কল্পনার দরকার তা আমরা কোথায় পাব? অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সেই ধনে ধনী। তাঁর 'কর্মক্ষেত্র' নেহাত 'কর্মখালি' নয়। তার চেয়ে বেশি। তাতে উদ্বুদ্ধ হবার উপাদান আছে। তা পড়তে পড়তেই তো সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'কাজের বাংলা' লেখার প্রেরণা পান, যা ওই সাপ্তাহিকে কয়েক কিস্তিতে বেরিয়েছিল (পরে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীরই স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী থেকে বইও হয়)। কাজের জগৎ নিয়ে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর উৎসাহের আরও প্রমাণ তাঁর প্রকাশিত সাময়িকী 'পেশাপ্রবেশ'। অথচ প্রতিষ্ঠিত শিশুসাহিত্যিক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে 'কর্মক্ষেত্র' বা 'পেশাপ্রবেশ' সম্পাদকের যোগ কোথায়? ব্যক্তিমানসের বিরল বহুমুখীনতায়? যার আরেক অভিজ্ঞান তাঁর 'ভ্রমণ' পত্রিকা। অবশ্য ভ্রমণ তাঁর নিজের নেশাও। বিশ্বভুবনের কোথায় না তিনি গেছেন। কত রকমের না মানুষ দেখেছেন, যেমন সাদা-কালো তেমনি হলুদ-বাদামি। শুনেছেন কত না বিচিত্র স্বর। সেই অভিজ্ঞতাও তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন— লিখে, বলে, ছবি দেখিয়ে। আর এই পত্রিকা শুধু তাঁর নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনাচ্ছে না, অন্য ভ্রমণপিপাসুদেরও গল্প বলছে। আমির আবরণ খসিয়ে যে-সর্বের বোধ ভ্রমণ থেকে জন্মাতে পারে তা শ্লাঘনীয়।

সম্পাদক আর লেখকের এক সেতুবন্ধ কি তিনি রচনা করেই চলেছেন? সাহিত্যপত্রিকা 'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রথম পর্যায়ের কথা বিশেষ করে ভাবছি। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিষাদগাথা' তাতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। বস্তুত প্রথম সংখ্যাতেই শুরু হয়েছিল। আমি অবশ্যই এ বলছি না যে ধারাবাহিক 'বিষাদগাথা' ছাপবার জন্যই 'কালের কষ্টিপাথর'-এর জন্ম, বরং উল্টোটাই; কারণ আরও অনেক কিছুই তাতে ছাপা হচ্ছিল। সাহিত্যপাঠককে রস জোগান দেবার এক আস্ত আয়োজন ছিল তা। দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে যে একদা 'সারস্বত প্রকাশ' সম্পাদনা করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা হয়তো কাজে লেগেছিল। সেই সুদৃশ্য সাময়িকীর কথা তদানীন্তন পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে।

ধারাবাহিক ছাপা শেষ হবার কিছুদিন পরেই 'বিষাদগাথা' বই হয়ে বেরোয়। স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী থেকে। প্রচ্ছদ লেখকেরই, তাঁর চিত্রকলার সাক্ষী যা তাঁর আরেক কৃতী। 'বিষাদগাথা' এক গ্রামের গল্প। তার এক নদী ছিল। তা অনেককাল আগে মজে গিয়ে এক বাদা তৈরি করে রেখেছে। সেই বাদায় একদা এক অমিত ক্ষমতাবান জমিদার, এখানকার এই জমিদারিহীন চৌধুরীদের ঠাকুরদা, সাত বিদ্রোহী চাষিকে খুন করিয়ে কবর দিয়েছিলেন। সেই অতীত এক জাদু বাস্তব হয়ে এই উপন্যাসকে ধরে ফেলেছে। নদীর খোঁজে বা নদীর বালিতে সোনার খোঁজে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একদিন সাত কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল। যদিও তা দু-তিন পুরুষ আগের কথা, তার রেশ রয়ে গেছে উপন্যাসের বর্তমানে (প্রথম ঘটনাই তো ওই বিদ্রোহীদের দুই বংশধরের হাতে এক চৌধুরী-তনয়ার সহিংস ধর্ষণ), যা নিজেই আবার তিন পুরুষে প্রোথিত। কঙ্কালরা

যে শুধু বেরোল তাই নয়, মাটি খোঁড়াচ্ছেন যে অকুতোভয় চৌধুরী তাঁর স্বপ্নেও রোজ আবির্ভূত হতে লাগল। উপন্যাস তার নাম নিয়েছে তদন্ত গর্ত এক রচনা থেকে যার ধারাবাহিক প্রকাশ এই বইয়ের প্রচ্ছদের দুই বিষাদাপন্ন চক্ষুষ্মানকে যেমন লোকসাধারণের মর্যাদা দিয়েছে তেমনি শাসকগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত বৈরী করে রেখেছে। কোনও প্রত্যক্ষ নায়ক নেই এ উপন্যাসের, কিন্তু তার আগাগোড়া অনেকটাই যে ধরে রেখেছে সে ওই অন্তর্গত 'বিষাদগাথা'-র রচয়িতা। আর তার নদী হারিয়ে যে-গ্রাম হাঁটছে শহরের পথে তার গাথা তো বিষাদগাথাই হবে। নতুন ক্ষমতাবানেরা শখের বহুতল আবাসন তোলাবে গ্রামের ওই বাদা দখল করে, যার উপরিভাগ একসময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙেও পড়বে। আবার, তাদের ক্ষমতার প্রতিপক্ষে গড়ে উঠবে এক জঙ্গলবাসী যুবদল যাদের কাছে বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। সবটাই চেনা গল্প; কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে জাদুবাস্তব। উপন্যাস শেষে বেঁচে থাকা তরুণ-তরুণীর উভচর সাইকেলও তাই— আকাশে চলতে পারার দ্যোতনা স্বপ্নের, যার প্রয়োজন এই মৃত্যু উপত্যকায় বুঝি-বা শিরোধার্য, বিশেষ করে যখন দেখি প্রমোটারের হাতে চৌধুরীবাড়ি ভাঙার পরে আর যে-একজন বেঁচে ছিল সে এক যুগ আগেই তার দুই যমজ ভাইয়ের আকস্মিক অন্যায় হত্যাতে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

'বিষাদগাথা' নিয়ে এতটা বলবার কারণ এর বিপুল বুনন। এর উৎসর্গ 'জীবনানন্দ দাশ স্মরণীয়েষু' কি এই কারণে যে কবি জীবনানন্দ দাশ উপন্যাসও লিখেছিলেন? অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথম বই কবিতার, 'বিক্ষত অন্বেষণ' (১৯৬২)। 'নিরন্তর' সহযোগে ('বিক্ষত অন্বেষণ, নিরন্তর') তার যৎকিঞ্চিৎ মার্জিত পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৭৩-এ। কবিতা তাঁর স্বভাবে ছিল, যদিও খুব বেশি তিনি লেখেননি। অনেক পরে ছাপা 'নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে'-র (২০০৬) কোনও কোনও কবিতা বারবার পড়বার। যেমন—

শেষ প্রার্থনা

'মা' ডাকার মতো শুদ্ধ হোক সেই ধুলোমুখ বায়ু
চরম দুঃখীও পাক ভালোবাসা, ভাত, পরমায়ু।

এছাড়া চাওয়ার কিছু নেই
এছাড়া পাওয়ার কিছু নেই

নদী জানে এই কথা, কচি নিমপাতারাও জানে।
খাতায় লিখে কী লাভ, লেখো হাড়ে, চিবুকে ও প্রাণে।

বা

অগ্নি

নিরক্ষর অগ্নি, তোকে কী করে লেখার কথা ভাবি।
মূক ও বধির, তুই আর কত পৃথিবী পোড়াবি?
দেখা তোর আদি শিখা, জ্যোৎস্নাজন্ম, রামধনু রূপের আদল
সন্তানের চক্ষে তোকে রেখে যাবো— সন্তানের চোখের কাজল।

খনার বচনের আদলে তিনিও 'ক্ষণকথক' ছদ্মনামে ১১১টি 'ক্ষণের বচন' লিখেছেন। তার দুটি

একে সত্য, দুইয়ে শিষ্য, দশে অন্ধ তালি।
এই হলো চিরকাল পথের পাঁচালি।

যে ভাবে সে সর্বজ্ঞ
আসলে সে বড় অজ্ঞ

তাঁর একাশি পদার্পণে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে আমার সাতাশির নমস্কার।

লেখক পরিচিতি
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, প্রাবন্ধিক